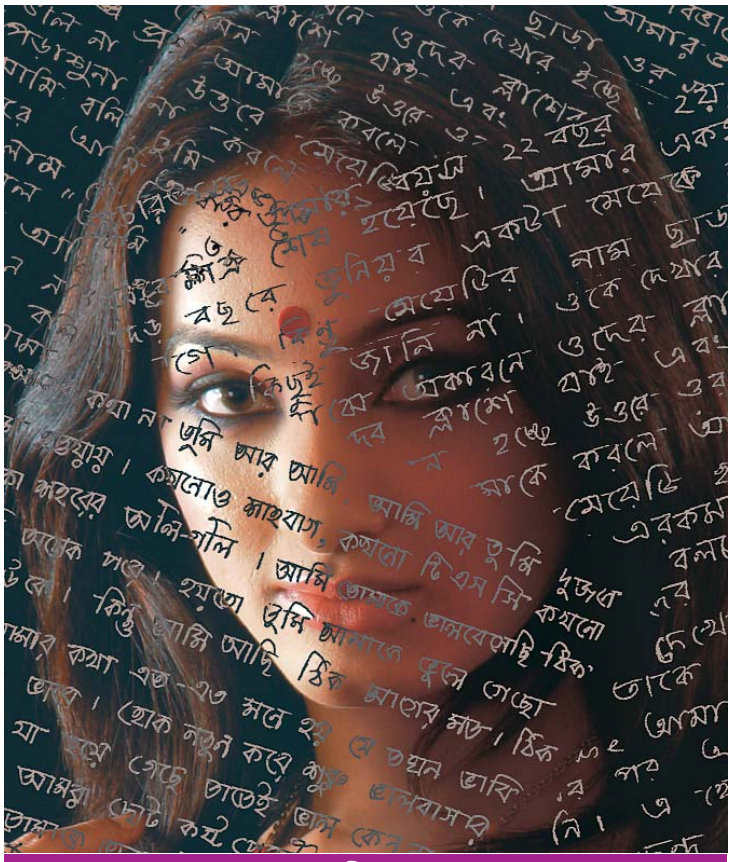

সুচরিতার

পত্রলেখা

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, চিরকূটে থাকে আকুতি, হৃদয় জানালায় থাকে পাশের বাড়ি অচেনা ছেলেটির কথা, চিঠি লেখে কঠিন সমস্যা নিয়ে সুচরিতাকে পাঠক-পাঠিকারা। সব দেখে সুচরিতা বিশ্লেষণ করেন না সব সময়। সম্পাদক তখন তাকে লিখতে বলেন তার উপলব্ধিগুলো। পত্র লেখা সম্পর্কে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্লেষণ। দিয়েছেন সুচরিতা...

কার্ড পাঠিয়েছেন কাউকে? ভুলে গিয়েছিলেন 'ভ্যালেনটাইন ডে', ভালোবাসার দিবস? ইচ্ছে করেই কার্ড পাঠাননি? আপনি দিনটিকে স্বদেশী কালচারের সঙ্গে মেলাতে পারেন না। কিন্তু ভালোবাসার কি দেশ-কাল-পাত্র থাকে? মেনে নিলাম কালচার। ২ ফাল্গুন না করে ১ ফাল্গুন থেকে শুরু হতে পারতো এখানে ভালোবাসা দিবসের আমাদের ভালোবাসার জন্যে সুন্দর একটি দিন। এ বছরের ট্রেন মিস করলে আবার এক বছরই অপেক্ষা করতে হবে।

একজন একটি চিঠি লিখেছিলেন গত বছর। তিনি ভালোবাসার দিনক্ষণ বিশ্বাস করেন না! সারা বছরটাই থাকে, দিন থাকে না। কারণ তার সঙ্গে যে ছেলের সম্পর্ক ছিল ১ বছর ৬ মাস ১৩ দিন। প্রতিদিন সে একটি করে চিরকূট বা কার্ড দিয়েছে। প্রতিদিনই ছিল তাদের ভালোবাসা দিবস। এখন দেবার মতো কেউ নেই। আমার পরিচিত, হ্যাঁ বন্ধু, পরমাত্মীয় বেঁচে থাকলে পুরো সেক্রেটারি হিসেবে এক্সটেনশন এখন নিতেন বা অবসরে যেতেন। তাদের কথা বলি। ওরা দু'জনই থাকতো একই পাড়ায় কাছাকাছি। তার বান্ধবীর একটি খাতা ছিল। একই খাতায় সে চিঠি লিখে দিতো, পাড়ার মেয়েটি তাতে উত্তর লিখতো এবং খাতাটি ফেরত দিতো। ছেলেটি আবার তার উত্তর দিতো। খাতা শেষ হলে নতুন খাতা। বছরে কয়েকটি খাতা জমে যেতো। সবই রেকর্ডেড, সব প্রমিজ, সব স্বপ্ন, সব শপথ। বিয়ের পর এদিক-ওদিক হলে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বের হয়ে যেতো! তাদের এই প্রেম আমার একটি চমৎকার উদাহরণ।

ভ্যালেনটাইন ডে একটি অবতারণিকা। কথা বলার একটি সুযোগ নেয়া। যা আমি বেশ কিছুদিন ধরে ভেবেছি আমার কিছু কথা জমেছে আপনাদের চিঠি পড়তে পড়তে। হ্যাঁ হৃদয় জানালা, চিরকূট ও আমাকে লেখা 'সুচরিতাসু' চিঠি পড়ে। বিশেষ করে ভালোবাসার দিবসে বিজ্ঞাপন ও চিঠির ব্লক

দেখে লেখা উচিতই মনে করছি। আমি এক সময় ছাত্র জীবনে জড়িত ছিলাম শাহাদত চৌধুরীর সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লেখক হিসেবে। তখন ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে নিজেই দিয়ে বসলাম। আমি নিজের বর্ণনা দিয়ে নামটা একটু বদলে বাড়ির ঠিকানাই দিয়েছিলাম। থাকতাম এলিফ্যান্ট রোডে। আমি '৮৪ সালে তিন হাজারের ওপর চিঠি পেয়েছিলাম। এগুলো নিয়ে কি করলাম? প্রত্যেকটি চিঠি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। কয়েকটি ভাগ করলাম। প্রথম ভাগ 'বাতিল'। যা অর্ধেকের বেশি। এখানে গেলো সেসব চিঠিই, যেগুলো নানা বয়সী 'বিকৃতমনা'রা লিখেছে যার মানে নেই। যারা বাথরুমের দেয়ালে লেখে। মেয়েদের নাম দেখলেই তার নামে কিছু বলে বা লিখে আনন্দ পায়। দ্বিতীয় ভাগকে বিকৃতমনা বলবো না। এদের বলা যায় সমাজ পরিস্থিতির শিকার। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি, কিন্তু একটি মেয়েকে বলতে চায় কিছুটা সে জন্যই বলা। তৃতীয় গ্রুপ হলো, প্রেম নিবেদন সরাসরি। আমি কে কি কিছু না বুঝে, বুঝতে না চেয়েই। এরা মূলত সমাজ সচেতন নয়। শ্রেণী, শিক্ষা কোনো বিভাজনকে বিশ্বাস করে না। একটি বিষয়ে বিশ্বাস তার পুরোপুরি সে 'পুরুষ'। সে যেকোনো মেয়েকে প্রস্তাব দিতে পারে, এটা তার পৌরুষ অধিকার। চতুর্থ হলো প্রেম নিবেদন, একটু না একটু কেন বেশ রোমান্টিক। কিছুটা সমাজ শ্রেণী সচেতনতা আছে। পঞ্চম শ্রেণী হলো যারা প্রেম নয়, বন্ধুত্ব চেয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম বিভাগ থেকে ২৫টি চিঠি মাত্র নিলাম যার উত্তর দেয়া যায়।

আমি এখানে বলে রাখছি এই পাঁচটি বিভাগ করলাম তার কারণ অন্য। পত্র লেখকরা (সেই সময়ের) ক্ষমা করবেন। আমি বিজ্ঞাপনটি দিয়েছিলাম একটি 'মনোগ্রাফ' লেখার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ঘটনাটা একজন ক্লাসমেটকে বললাম। সে ইউনিভার্সিটি সেমিনার শিক্ষককে বলে বসলো। মজার ব্যাপার হলো বেশ কৌতূহল নিয়ে পুরোটা শুনে বললেন, এটাই হোক তোমাদের সেমিনার মনোগ্রাফের সাবজেক্ট। তুমি সারাংশ জমা দাও। আমি জমা দিলাম। শুরু হলো চিঠিগুলো স্ক্যানিং। সামাজিক-মানসিক প্রেক্ষাপট নির্মাণে ছোটখাটো সামাজিক সার্ভে/থিসিস! শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। আমার সাবজেক্টের কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের উৎসাহ বেড়ে গেলো। তিনি আমার এক সহপাঠীকে বললেন, তুমি একটি ছেলের নামে বিজ্ঞাপন দাও, দেখি কেমন রেসপন্স পাওয়া যায়। তাই হলো।

উত্তর এলো আড়াইশ'র মতো। এটা অতো ভাগ করতে হলো না। প্রথম ভাগে কিছু চিঠি বাদ গেলো যা মূলত লিখেছে বেকার ছেলেরা, মেয়েদের নাম। এটা করা হলো হাতের লেখা, বক্তব্যে কিছু বিভ্রাট, ছেলেমানুষিপনা দেখে। এর পরের তিন ভাগ ১. বিয়ে করতে রাজি ২. প্রেম করতে চাই ৩. বন্ধুত্ব দিয়ে শুরু হোক।

ছেলের নামে আর একটি চিঠি ছাপা জরুরি হয়ে পড়লো। প্রথম চিঠিটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঢাকায় থাকে। ভবিষ্যতে কি করবে জানে না। শিক্ষক শেষ বাক্য নিয়ে বললেন, এটার ওপর মেয়েরা বিশ্বাস রাখে না। এবার বিজ্ঞাপনে বলা হলো ছেলেটি বিদেশে সেটেল করতে চায়। তার সে সুযোগ আছে। উত্তর এলো সাড়ে সাতশ'। বাতিল চিঠি বাদ দিলে দেখা গেলো প্রেম করতে চাই সবচেয়ে বেশি। বিয়ে করতে আপত্তি নেই দ্বিতীয় অবস্থানে। বন্ধুত্ব করতে আগ্রহীর পরিমাণও কম নয়। এখানে বলে রাখা ভালো চিঠি দুটোই ছাপা হয়েছিল '৮৪ সালের আগে। ছেলেটির দুটো চিঠির মধ্যে উত্তরের তারতম্যটা লক্ষণীয়। আমরা দু'জন মিলে মনোগ্রাফটা তৈরি করলাম। এখানে এখন পুরো স্মৃতি থেকে বিশ্লেষণটা তুলে ধরবো। পাঠকরা দেখবেন আমাদের সমাজ প্রায় বিশ বছরে কতটুকু বদলেছে।

লেখা তৈরি করার আগে আমরা দু'জন বিচিত্রা অফিস থেকে, পুরনো দোকানে গিয়ে পুরনো 'বিচিত্রা' সংগ্রহ করলাম, যখন থেকে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন শুরু হয়েছে। অনুমান করে বলছি '৭৭ সাল থেকে বোধহয় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন শুরু হয়। এখানে কবি রফিক আজাদ, হাবিবুল্লাহ সিরাজী থেকে তসলিমা নাসরিন, জসিম মল্লিক অনেকের নাম পাওয়া গেলো। দেখলাম বিজ্ঞাপনে আবার স্টার সুপার স্টার আছে। যেমন পাহাড়ি কুমার লেখেন সিলেট থেকে, দুলাল বরিশাল ইত্যাদি। তারপর ছিল রূপ কুমার ইত্যাদি আরো কত। পাঠক দুঃখিত, আমি একটু স্মৃতিতে চলে গিয়েছিলাম। এটা আমাদের বিষয় নয়। বিষয় আমাদের থিসিস ও এখনকার পত্র লেখা। থিসিসেই ফিরে যাই।

আমি আমার নামে বা একটি মেয়ে বিজ্ঞাপন দিলে যেসব চিঠি আসে তার একটি বড় অংশকে বলেছি 'বিকৃতমনা'। এই বাক্যটি সমাজ মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যা ছাড়া বলা উচিত নয়। কিন্তু আমি এখানে সহজে বোঝার জন্য লিখেছি। মূলত এরা লেখাপড়া কম জানে, ছোটখাটো কিছু করে বা বেকার। মেয়েদের কাছ থেকে দেখেনি। মেয়েদের কাছ থেকে তাচ্ছিল্য পায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ সচেতনভাবেই লিখেছে। কারণ সে পতিত শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীকে আঘাত করতে চায়। শ্রেণী বিভক্ত একটি সমাজে এটা হতে পারে। এরা নাগরিক শ্রেণী থেকে এসেছে কিন্তু জেনে গেছে শ্রেণী অতিক্রম করার ক্ষমতা তার নেই বা সে সুযোগ সে মিস্ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণী সামাজিকভাবে কাছাকাছি নয়। মনের দিক থেকে কাছাকাছি। এদের বয়স বেশি হতে পারে কারো কারো। এরা মেসে থাকে অনেকে মিলে। অফুরন্ত অবসর। কেরানি বা এই ধরনের চাকরি করে যাতে সাহস জিনিস উধাও হয়ে যায়। হাতের লেখা ভালো। চিঠি লেখার কিছুটা বাতিকও পেয়ে বসে। চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে সরাসরি প্রেম নিবেদন অন্যান্য ইঙ্গিত ছাড়া বলেছি রোমান্টিক বটে। এদের মধ্যে কম ও বেশি বয়সী আছে। বেশ বড় একটা অংশ গ্রাম থেকে এসেছে বা চিঠি পাঠিয়েছে মফস্বল শহর থেকে। এদের হাতের লেখা, বানান দুটোই ভালো। প্রেমপত্র লেখা বাতিক। এরা শ্রেণী সচেতন। মূলত এদের মধ্যে অনেকে ব্যর্থ প্রেমিক, কবি ও লেখক রয়েছে। সবচেয়ে মজার বিভাগ হলো তৃতীয় বিভাগ। চিঠির সংখ্যা তত না হলেও কম না। এরা সামন্ত শ্রেণী থেকে এসেছে শহরে থাকলেও। তবে বেশির ভাগ মফস্বল শহরের। বোঝা যায়, বেশ সম্পন্ন ঘরের।

অনার্সে পড়া মেয়েকে দু'বার বিকম দেয়া ছেলে বা বাবার ব্যবসা দেখছে এমন কেউ লিখছে তোমাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই। পুরুষ আধিপত্য কতখানি হতে পারে বা তার সীমা কি এই বোধ এদের মধ্যে নেই। এরা মনে করে একটি মেয়ের জন্য মর্যাদাই হলো শেষ কথা। ছেলেদের যে চিঠিগুলো বন্ধুত্ব চায় তার সংখ্যা-পরিসংখ্যানে কম। এরা নানা

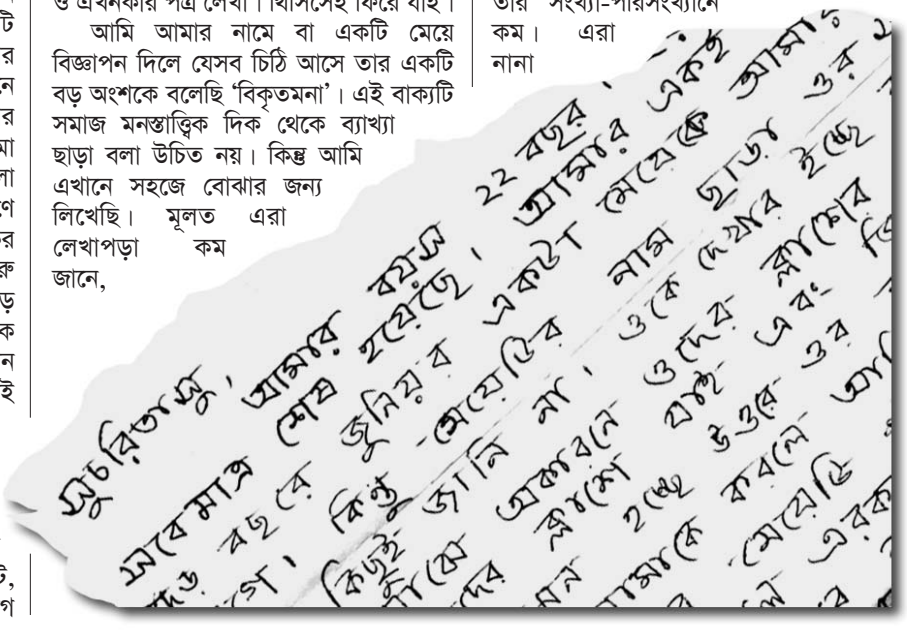

অংশ থেকে লিখেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং শিক্ষিত। ছেলে-মেয়ের পত্রমিতায় সিরিয়াস এমন বেশ কিছু আছে। বোঝা যায়, বন্ধু বলতে 'পত্রমিতা' কনসেপ্টে এরা বিশ্বাস করে। এতে কোনো ইঙ্গিত নেই। এরা তথ্য বিনিময় চায়, মন বুঝতে চায়। কিছুটা দ্বিধান্বিত। একটি অপরিচিত মেয়েকে প্রথম চিঠিতে প্রেম নিবেদন যে করতে হয় না এটা জানে। এরা শিক্ষিত। বানান ভুল নেই। কথাও কম।

যে ২৫টি চিঠি বাছাই করলাম উত্তর দেবো ভেবে উত্তর দিয়ে কি উত্তর পেয়েছিলাম? না সবক'টা চিঠির উত্তর দেইনি। খুব ইন্টারেস্টিং আটটি চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম। এটা কিন্তু আমার মনোগ্রাফের বিষয় ছিল না। উত্তর দিয়েছিলাম পুরো ব্যক্তিগত কৌতূহলে। প্রতিউত্তর পেয়েছিলাম সবার কাছ থেকে। দু'একজনের সঙ্গে পত্রালাপও ছিল অনেক দিন। তারপর সেটা পরে একদিন বলা যাবে। আমি বিষয়ে ফিরে যাই।

মেয়েরা দু'জন ছেলেকে লিখেছে, দু'ভাগে। দুই নামে দুই ঠিকানায়। দেখা গেলো একই মেয়ের চিঠি দু'জনের কাছে। প্রেম, বন্ধুত্ব, বিয়ে তিন বিভাগেই 'কমন' মেয়ের সংখ্যা কম হলো না। তার মানে দাঁড়ালো চিঠি লেখা
মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশি নেই। কিন্তু রীতিমতো 'প্রফেশনাল' পত্রলেখিকা আছে, যারা অনেক চিঠিই লিখতে পছন্দ করে। অদ্ভুত লাগলো এসব মেয়েদের অনেকে অকারণে চিঠি লিখেছে কিন্তু নিজেদের ঠিকানা দেয়নি। কয়েকজন কয়েক দিন পরই আর একটি চিঠি লিখলে, তাতে লেখে কি ঠিকানা খোঁজ করছিলেন? আর এ ক টু

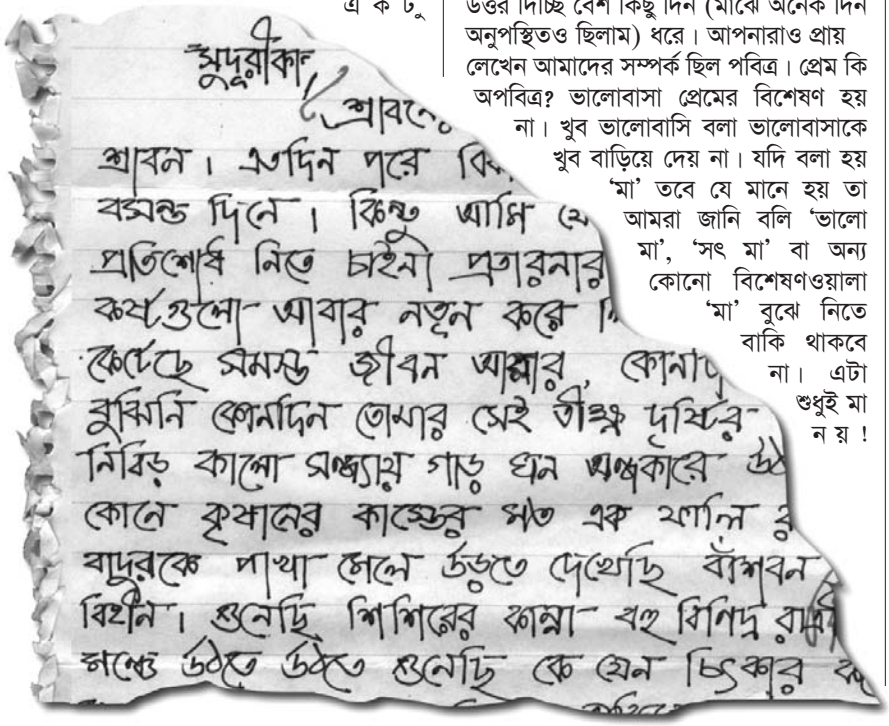
সুদূরিকা
শ্রাবণে
শ্রাবন। এতদিন পরে কি
বসন্ত দিনে। কিন্তু আমি
প্রতিশোধ নিতে চাইনা প্রতারনার
কষ্টগুলো আবার নতুন করে
কেটেছে সমস্ত জীবন আমার, কোনো
বুঝিনি কোনদিন তোমার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির
নিবিড় কালো সন্ধ্যায় গাঢ় ঘন অন্ধকারে
কোনে কৃষাণের কাস্তের মত এক ফালি
বাদুরকে পাখা মেলে উড়তে দেখেছি বাঁশবন
বিহীন। শুনেছি শিশিরের কান্না বহু বিনিদ্র রাত্রি
জেগে উঠতে উঠতে শুনেছি কে যেন চিৎকার

অপেক্ষা করুন! এরা সচেতন লেখিকা। 'টিজার', পুরুষ টিজার। উসকে রাখতে চায়। বুদ্ধিটা খারাপ না।

মেয়েদের চিঠি ও ছেলেদের চিঠির মধ্যে তফাত আকাশ-পাতাল। মেয়েরা শুদ্ধ ভাষায় লেখে। সমাজ সচেতন, একটু হেঁয়ালি থাকলেও, ইঙ্গিত কম। বন্ধুত্বই প্রাথমিকভাবে চেয়েছে। বলেছে বন্ধুত্বই যদি হয় তো প্রেমে পৌঁছে দেবে। যে মেয়েরা উত্তর চায় তারা ছেলে বরাবর চিঠি লেখার পর বললো, অমুক তারিখে অমুকের নামে একটি চিঠি লিখুন, আমি চিঠি পেয়ে যাবো। দেখা গেলো একটি হোস্টেলের ঠিকানা। নাম অন্য। মেয়েরা অনেক সাবধানী!

ছেলেরা শুদ্ধ-অশুদ্ধ চিন্তা মাথায় রাখে না। হাতের লেখার অবস্থা যা ইচ্ছে। এর কারণ হতে পারে মেয়েরা মূলত স্কুল-কলেজে পড়া। ছেলেদের মধ্যে ঘটনা হলো একটি মেয়ের ঠিকানা একজন জোগাড় করে সবাই মিলে চিঠি লিখতে বসে যায়। মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখেছে।

যাদের ভাষা শুদ্ধ এবং বাক্য গঠন সঠিক। তারাও লিখেছে একটি কমন শব্দ 'তোমাকে পবিত্রভাবে' পেতে চাই। পবিত্র নিয়ে রীতিমতো রিসার্চ করতে হয়েছে। এর প্রয়োগ দেখে যে বন্ধুত্ব চেয়েছে সে পবিত্র বন্ধুত্ব বললে মানে কিছুটা বোঝা যায় কিন্তু যে না দেখেই বলে তোমাকে পবিত্র চোখে দেখি এই 'পবিত্র' অনেক অর্থ করা যায়। একটি পবিত্র অপার্থিব, প্রেমিকের মতো নয়।

এখানে এ প্রসঙ্গটি তুলছি ইচ্ছে করে, এ বিষয়ে আমার কিছু কথা আছে ২০০০-এর পাঠকদের সঙ্গে। আমি যে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি বেশ কিছু দিন (মাঝে অনেক দিন অনুপস্থিতও ছিলাম) ধরে। আপনারাও প্রায় লেখেন আমাদের সম্পর্ক ছিল পবিত্র। প্রেম কি অপবিত্র? ভালোবাসা প্রেমের বিশেষণ হয় না। খুব ভালোবাসি বলা ভালোবাসাকে খুব বাড়িয়ে দেয় না। যদি বলা হয় 'মা' তবে যে মানে হয় তা আমরা জানি বলি 'ভালো মা', 'সৎ মা' বা অন্য কোনো বিশেষণওয়ালা 'মা' বুঝে নিতে বাকি থাকবে না। এটা শুধুই মা ন য় !

তেমনি যেভাবে 'পবিত্র' মনের মেয়ে বন্ধু চাই বা ছেলে বন্ধু চাই লেখা হয় চিরকূটে তা পড়ে আমার কাছে প্রথম মনে হতো ধার্মিক নামাজ রোজা রাখা বন্ধু খুঁজছে! পরে দেখেছি : যে মেয়ে আমার সঙ্গে রিকশায় ঘুরতে যাবে, আজিজ সুপার মার্কেটে আড্ডা দেবে ইত্যাদি। দেখলাম পবিত্র সম্পর্ক দেহাতীত ব্যাপার বোঝানো হয়। সেখানে বন্ধুত্বের কথা আসবে কেন? একইভাবে অর্থ করলে প্রেমের ক্ষেত্রে আবার 'পবিত্র' কথা লেখা হচ্ছে কেন? এতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রেম করা উচিত কি না আমি সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য রাখছি না। তবে আমার কেন যেন মনে হয় এখানে পত্র লেখকরা 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনি' (!) মত লিখেছেন। মেয়েরা কিন্তু এদের নিয়ে সাবধান থাকে!

বন্ধুত্ব ও প্রেম দুটো দু'রকমই হবে। বন্ধুত্ব যে কোনো এক সময় হয়তো অজান্তে সীমা অতিক্রম করবে না তার জন্যও শপথ নেবার প্রয়োজন হয় না। তেমনি প্রেমের নিজস্ব চরিত্র থাকবে। সেটা নির্ধারিত হয়ে যায় প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক স্বপ্ন সামাজিক পরিস্থিতি হিসাব করে। অজান্তেই আচরণবিধি তৈরি হয় নিজস্ব। সেটার জন্যে নথি লাগে না। নিজেরাই বুঝে নেয়। পবিত্র বলতে আমরা কিছুই বুঝি না। এটা এক ধরনের হঠকারিতা। শুনতে মনে ভালো লাগে বা নিজেকে সেফ জেনে রাখতে চায়। অন্য একটি অবচেতন কারণ হলো 'মিথ'। ছেলেরা বড় হয় একটি মিথের মধ্যে। তাদের 'পৌরুষ'কে মেয়েরা ভয় পায় এটাই তার 'মিথ'। তারা ইচ্ছে হলেই যা ইচ্ছে করতে পারে। মেয়েরা তা পারে না ইত্যাদি। অন্যটি আসে পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা থেকে। ১৮ বছরের ছেলেটি ছোট বোন বা কাজিনদের দেখেছে তাকে মেনে চলে। দেখছে মায়ের ওপর পিতার আধিপত্য। ছেলেটি সেভাবেই দেখতে চায় প্রেমিকাকে। ভালো মেয়ে মানে যে প্রতিবাদ করে না। তার কাছে ভালোবাসা মানে আধিপত্য যে মেনে নেবে তারই সঙ্গে হবে। ছেলেরা সহযাত্রী চায় না অনুগত গামিনী চায়। মেয়েরা কিন্তু সরাসরি সহযাত্রী চায়। এদিকে মেয়েরা অনেক অগ্রসর।

তবে এই ২০ বছরে অনেক বদল হয়েছে। এখন তো ছেলেরা সরাসরি মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় বা পত্রমিতা চায়। বিশ বছর আগে বিজ্ঞাপনে দেখা যেতো ছেলেরা বিজ্ঞাপনে চাচ্ছে 'মিষ্টি ভাবীরা' লিখুন। কারণ, তখন চিঠি লেখার মতো মেয়ে ছিল খুব কম। ভাবীরা এখন কর্মজীবী। তখন হয়তো' মিষ্টি ভাবীদের অবসর ছিল অনেক বেশি। এর থেকে একটি চিত্র পাওয়া যায়। আমি নাগরিক মেয়ে, জন্ম থেকে। গ্রামে যেতে হয় বিভিন্ন কাজে বা বেড়াতে। সেখানে কুমারী মেয়েরা কথা হয়তো বলে সম্পর্কিত আত্মীয় বা কুটুমদের সঙ্গে। কিন্তু আড্ডা দিতে হলে সেটাতে ভাবীদের থাকতে হয়। আড্ডায় ভাবীর পেছনে এদের দেখা যায়। পাশ থেকে ফোড়ন কাটা যায়।

অন্যদিকে গ্রামে ভাবীরা বেশ খোলামেলা কথা বলেন। যা শুনলে অনেক সময় কান গরম হয়ে যায়।

মিষ্টি ভাবী তো ভালো। বাংলা উপন্যাসে ভাবী-বৌদির উপাখ্যানে বোঝা যায় বাঙালি 'সাইকি'তে ভাবী-সিন্ড্রম থেকে যাচ্ছেই। যার ছাপ আমাদের জীবনেও চলে আসে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের আরেক ধরনের বিজ্ঞাপন দেখা যায় তা হলো আমাকে চিঠি লিখুন। আপনাকে আবার ছোট বোন হিসেবে দেখবো। আমাকে লেখা যে হাজার তিনেক চিঠি এসেছিল তার বিরাট একটা অংশ শুরু করেছিল 'বোন' বলে। যাদের চিঠির উত্তর দেয়া হয়নি। তারা দ্বিতীয়বার লিখেছিল 'তুমি উত্তর দাওনি আমার চিঠির। অথচ তোমাকে ছোট বোন হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম'। বেশ কয়েকজন লিখেছিল 'আমার একটি বোন ছিল সে এখন এ জগতে নেই। তার জায়গায় তোমাকে বসাতে চেয়েছিলাম। ভাবী 'সাইকি'র মানে ব্যাখ্যা হলো বোনের ব্যাখ্যা চাইতে স্বয়ং ফ্রয়েডকে আসতে হবে। এখানে কি এক ধরনের অভয়দান প্রেম করতে চায় না? না, তা নয়। আমার বান্ধবী আইনে পড়াশুনা করতো। খুবই সুন্দরী। অনেক চিঠি পেয়েছে জীবনে। একবার এক নিরীহ ক্লাসমেট বিশাল এক চিঠি লিখে বসলো। মফস্বল থেকে এসেছে, পড়াশুনায় ভালো। আপা দিয়ে শুরু করেছে। তিন পাতা পড়ার পর আঁচ করতে পারলো কেন এ চিঠি। চতুর্থ-পঞ্চম পাতায় রীতিমতো কেন তার ঘুম হয় হয় না। আগেই আপা বলে ডাকতো ক্লাসমেটকে। সে-ই আপা থেকে তখন নামে চলে গেছে। বান্ধবীর রি-অ্যাকশন হলো বেচারা! একটু ক্যামোফ্লেজ করে শুরু করেছে যাতে আমি চিঠিটা পড়ি। আসলে আমি এখনো 'ক্যামোফ্লেজ' শব্দটা ব্যবহার করতে চাই এতো বছর পরও। ছেলেরা বোন পাতিয়ে এগুতে চায় বা নিজের অবস্থানটা তৈরি করতে চায়। তাছাড়া বাঙালি সমাজে, উপন্যাসে আপনি থেকে তুমি, তুমি আপনি হয়ে যাওয়া নিয়ে অনেক নাটকীয়তা হয়। নাম ধরে একটি মেয়েকে ডাকা মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধা আছে।

চিত্রতারকাদের যে চিঠি লেখে ভক্তরা তাতে নাকি বেশির ভাগ পত্র লেখক 'আপা' 'আপু' দিয়ে শুরু করে। যেমন 'আপু আমি আপনার একজন ভক্ত।' আরো একটি লক্ষ্য করার বিষয় হলো, একই অফিসে দেখা যাচ্ছে অল্প বয়সী একটি মেয়েকে সবাই আপা বলছে। বিষয়টির ব্যাখ্যা চাইলে দেখা গেল প্রথম অনেকে সম্বোধন অনুহ্য রেখে কথা বলতো। এর মধ্যে একজন জুনিয়র আপা ডাকা শুরু করলে সবারই আপা হয়ে যায়। নাম ধরে ডাকা নাগরিক সংস্কৃতি কেবল প্রবেশ করছে। বিবাহিতা হলে দিব্যি 'ভাবী' বলে ডাকছে, ভাইকে হয়তো জীবনে দেখেনি। অর্থাৎ সামাজিক ব্যাখ্যায় একটি ছেলে এবং মেয়ের সম্পর্ক মা-বোন-ভাবী-স্ত্রী এই চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কলিগ, বন্ধু বাকি সম্পর্কও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সম্পর্ক যেন অবৈধ, আবরণে থাকে। যেন এটা একটা আন্ডারওয়ার্ল্ড। ২০ বছর আগের মোনোগ্রাফের ওপরও নির্ভর করছি উপরের বক্তব্য করতে গিয়ে। এখানে আমি আরো ডিটেইলে যাবো। আমি যে বক্তব্যে যেতে চাচ্ছি তা হলো এ সমস্যা এখনো মৌলিক। এর মূলেই রয়েছে ছেলে-মেয়েরা পরস্পরকে চেনেই না।

আমার মনোগ্রাফের জন্য বিচিত্রার বিজ্ঞাপনগুলো পড়ি ও কিছু সমাজবিদ ও মনস্তাত্ত্বিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আমার মনোগ্রাফে সেগুলো সাক্ষাৎকার হিসেবে ছিল। আমি স্মৃতি থেকে তার সেসব সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ উল্লেখ করছি সার সংক্ষেপ করে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ব্যর্থ প্রেমিক প্রতি সপ্তাহে একই কথা বলে যাচ্ছে পয়সা দিয়ে একটি মেয়েকেই অথবা একাকী হৃদয়ের সঙ্গী খুঁজছে, ছেড়ে চলে যাওয়াকে বিশ্বাসঘাতক বলছে অথবা পত্রে মিষ্টি একাকী ভাবী খুঁজছে। এতে এই প্রজন্মের চেহারা পাওয়া যায়? মোটামুটি এই ছিল আমার প্রশ্ন এদের কাছে। তাদের উত্তর ছিল মূলত এই সমাজ, মানে যারা পত্রিকা পড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনো স্থিতি পায়নি। এই শ্রেণীর একদল উপরের চাঁদ ধরতে চাচ্ছে। বিত্তের সন্ধানে তারা কলম্বাস। অন্য দল সামন্ত শ্রেণী থেকে জমির টাকায় নগরবাসী হচ্ছে কিলবিল করে, এদের মধ্যবিত্ত চারিত্র্য আসতে সময় লাগবে। ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল '৭২-এ ৫ বা ৬ লাখ, ১৯৮৪ সালে ৪০ লাখের কাছাকাছি। এই নবাগত আর ২৫ বা ৫০ বছরের মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক গ্যাপ আছে। সে জন্য ছেলে-মেয়েরা সহজে মেলামেশা করতে পারে না। পুরনো মধ্যবিত্ত পতনের ভয় পাচ্ছে। সে জন্য মেলামেশা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাবধানী হয়ে যায়।

ষাট দশকে এটা ছিল না। আন্দোলন ছিল, ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই মেলামেশা করতো। অবশ্যি সে সময় সমবয়সীদের প্রেমের বিয়ে খুব একটা ছিল না। পরিবার থেকে চেনাজানা পরিবারের ছেলে-মেয়ে দেখা হতো। ছেলেরা সে সময় ২৫/২৬ বছর বয়সেই চাকরিতে যোগ দিতো বা দাঁড়িয়ে যেতো। যে মেয়ে অনার্স বা এমএ ২২/২১ বছর বয়সে করতো, সে ছেলেটির জন্যে অপেক্ষা করতে পারতো না। এখনো তাই হচ্ছে। বিশেষ করে সত্তর দশকে একটি ছেলেকে প্রফেশনে ঢুকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে তার বয়স পৌঁছাতো ৩০ বছরের ওপর। ও বয়স পর্যন্ত একটি মেয়ে অপেক্ষা করতে পারছে না মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। এ সময় দেখা যাচ্ছে অনেক মেয়ের বিয়ে হয়েছে অনার্সে থাকতেই ২৪ বছর বয়সের মধ্যে, ৩৩/৩৪ বছর বয়সী পত্রের সঙ্গে। কারণ নগরায়ন কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে। চাকরি কম, উপার্জন করে এমন পাত্র কমে যাচ্ছে ক্রমে। সে জন্য একটি মেয়ে সহজে কমিট করতে চাইতো না। বন্ধুত্বও এড়িয়ে গেছে বা সম্পর্ক বন্ধুত্বই রাখতে চেয়েছে।

এই সময়ই আবার বিদেশ যাওয়া শুরু হয়। প্রথম দফায় রাশিয়ায় ছাত্ররা। দ্বিতীয় দফায় মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির জন্য। তৃতীয় দফা রাজনৈতিক আশ্রয়ে সুইডেন বা জার্মানিতে। যার জন্য শুরু হয় বিচিত্রার প্রবাস থেকে কলাম। বিজ্ঞাপনেও প্রবাসী ছাত্র ও চাকরিজীবীদের বিজ্ঞাপন পরিমাণে ছিল বিপুল। তারা কেউ কেউ বিশেষ করে চাকরিজীবীরা পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিতো তাদের চাহিদা জানিয়ে। মজার ব্যাপার হলো বন্ধুত্ব বা পত্রমিতা চাইতো, 'মুক্তমনা মেয়ে' অথবা মিষ্টি ভাবী। কিন্তু পাত্রী খুঁজতে বলতো রক্ষণশীল পরিবারের, সুশ্রী, সুন্দর মনের মেয়ে। বিশ বছর পরও আমার এই কয়েক বছরের সমস্যার উত্তর দিতে গিয়ে এবং হৃদয় জানালায় আপনাদের চিঠি বা চিরকূট পড়ে

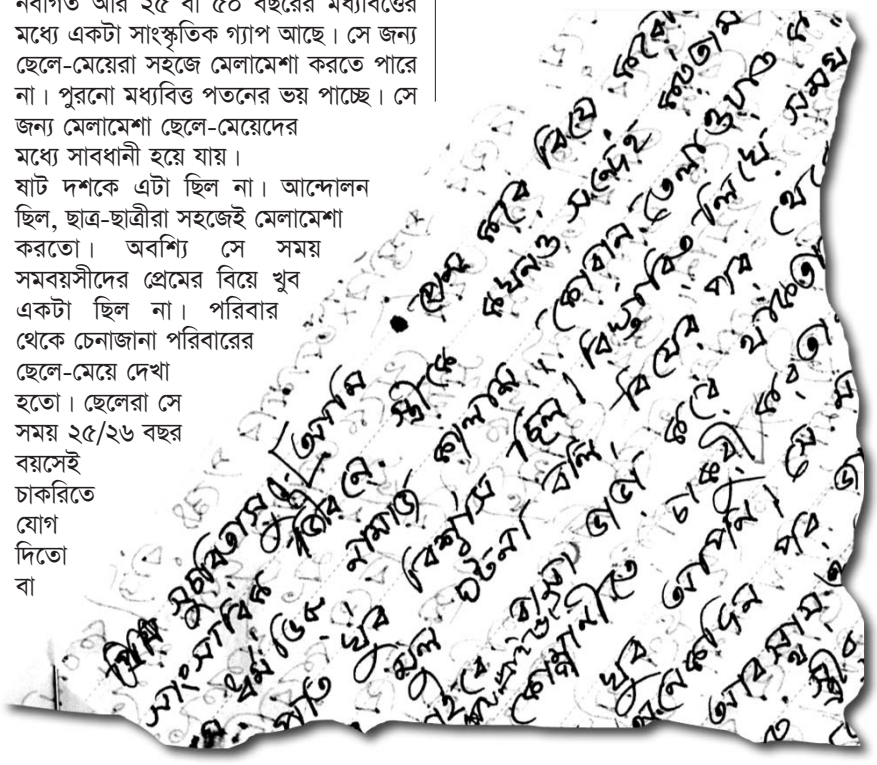

মনে হচ্ছে কিছুটা হলেও বদলে গেছে সময়। মিষ্টি ভাবীদের বা মুক্তমনা মেয়েদের চাহিদা কমেছে। বোধহয় এখন মেয়েরা বন্ধুত্বে সহজ হয়েছে বলে মুক্তমনা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 'সুন্দর মনের' চাহিদাটা থেকেই গেছে। এখন কেন যেন মনে হয় পত্র লেখক বা লেখিকাদের প্রেম আছে, ব্যর্থতার কান্না আছে, এগোনি পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা। জানি না সেই 'লহনা' এখন কোথায় আছেন। তার চিঠিতে যে ব্যথা এবং তার ব্যক্তিগত সংগ্রামকে পাঠকরা কিভাবে সমর্থন করেছিল ভাবতে অবাক লাগে। এখন মেয়েদের চেহারাটা ছেলেদের বেশ কিছু বদলেছে। মেয়েরা কেরিয়ার চায়, বায়বীয় প্রেম চায় না মিষ্টি বা মুক্ত হতে চায় না। হতে চায় নিজের পায়ে দাঁড়ানো নারী। সহযাত্রী চায়। ছেলেরা কিছুটা ভীত, সামান্য হলেও, তাই চায় মেয়ে লক্ষ্মী হবে, একটু দুষ্টু হবে এমন কিছু। দু'জনেই এখন স্থায়ী বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে।

সমাজে এ পরিবর্তনটা বিরাট বলেই আমি মনে করি।

তবে এখন আমার অবাক লাগে ১৮ বছরের একটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ম্যাচ্যুরিটির তফাত দেখে। এখনো ২০ বছর পর, ছেলেটি ১৮ বছর বয়সেই মেয়েটির কাছে বশ্যতা চায় বা 'আশা করে'।

খুব অল্প বয়সী ছেলেদের মাথায় একটা বিষয় ঢুকে আছে। তারা মনে করে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসে বলেই মেয়েটি তাকে মেনে নেবে। মেয়েটি কিন্তু দেখে ছেলেটির যোগ্যতা। রূপকথায়ও তাই। একটি ছেলে ভাবে এক নীল পরীর কথা, মেয়েটি কিন্তু তলোয়ার হাতে ঘোড়সওয়ার রাজপুত্র। ছেলেদের কল্পজগতের চেয়ে মেয়েদের কল্পজগৎ বাস্তবতার কাছাকাছি থাকে। বাস্তবেও তাই।

এর আগের যে বক্তব্যে ছিলাম, সমাজ ভাঙাচোরা হচ্ছে। মধ্যবিত্ত স্থিত হতে পারছে না। স্থিতি থাকছে না, হতে পারছে না মনের, হৃদয়ের চাহিদা বা স্বপ্নের অবয়ব তৈরি হচ্ছে না। হলেও তা মাত্রা নির্ধারণ করতে পারছে না। দু'জন পাশাপাশি পড়ছে, চলাফেরা করছে, আড্ডা দিচ্ছে কিন্তু স্বপ্নে যার যার নিজস্ব জগৎ। এখন সব কিছুতেই স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ হয়। এখানে হচ্ছে না। বেশ আগে ষাট দশকে আর একটা মিলন ক্ষেত্র ছিল মনের তা হলো দেশ ও রাজনীতি। আদর্শিক চিন্তাভাবনা। তা এখন নেই, সব গেছে মাস্তানদের দখলে। তখন মনের মিল হতো মননে। এখন হচ্ছে হয়তো ইন্টারনেটে ঘরে বন্দি হয়ে। ব্যক্তি মনন, দেখা হওয়া, বিতর্কে যাওয়া সব যেন গায়েব।

গায়েব নয়, এখানেও ঘটেছে বিভাজন। একদল ভালো ছাত্র চলে যাচ্ছে বিদেশে। অন্য একদল ভর্তি হচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। সম্পন্ন শ্রেণী সেভাবেই তাদের বিদ্যা চর্চা করে। মধ্যবিত্ত পরিবারও রিক্ত হয়ে ইনভেস্ট করছে, সন্তান পড়াশোনার জন্য শেষ করে কপর্দক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য। কঠিন এ প্রতিযোগিতা, অসম প্রতিযোগিতা। মেয়েটি কিন্তু যেতে পারছে না। তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দেশে বসে। হয়তো প্রাইভেটে দিচ্ছে বিএ পরীক্ষা।

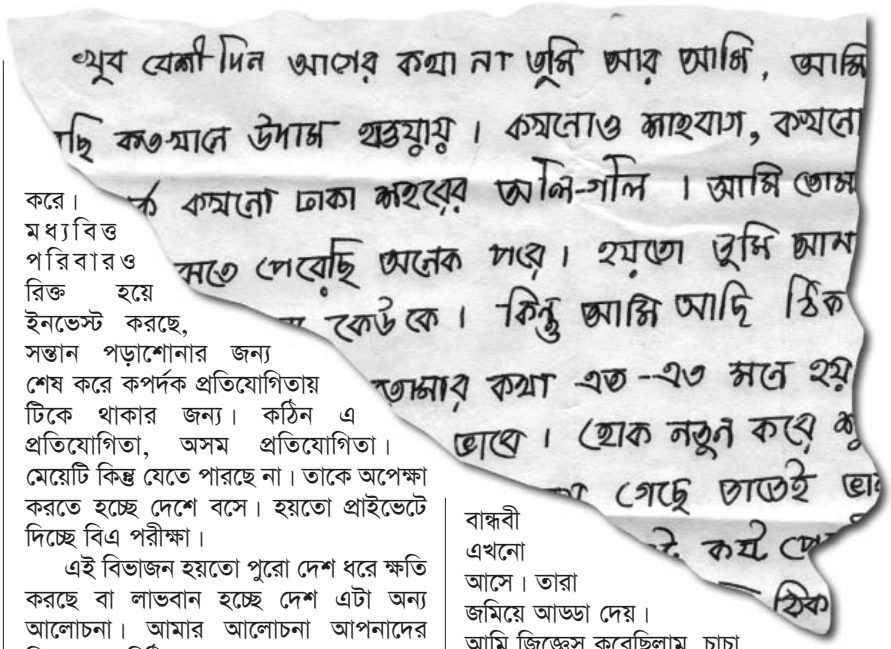

এই বিভাজন হয়তো পুরো দেশ ধরে ক্ষতি করছে বা লাভবান হচ্ছে দেশ এটা অন্য আলোচনা। আমার আলোচনা আপনাদের নিয়ে, যারা চিঠি লেখেন ঘরে বসে, পত্রবন্ধুকে, প্রেমিকাকে বা অচেনা একজনকে চিনতে চান।

এবার মনে হলো অনেক নবীন কিশোর তরুণ চিঠি লেখে শুধু একটি মেয়েকে জানার জন্য। যার জন্য পাশের ফ্ল্যাটে মেয়ে, ফুফাতো বোন বা পাশের বাড়ির এক 'আপা'কেই লিখে বসছে। কারণ তো আর কিছু নয়, জানতে চায় একটি মেয়েকে। আমার মা-খালাদের আমরা প্রাচীন মনে করলেও তারা হাসেন। আমি এখন বুঝি হাসির মানে। অনেক ক্ষেত্রে তারা অনেক অগ্রসর ছিলেন। মুক্ত ছিল মনের জানালা। কারণ একসঙ্গে অনেক ভাইবোন বড় হয়েছে। ছিল অনেক কাজিন। আমার খালারা দলবেঁধে পাড়ার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যেতেন বাসে করে। পাড়ায় পুরনো বাসিন্দা, নিজেদের বাসা, শিশু বয়স থেকেই বড় হয়েছেন একই সঙ্গে, একই ধরনের স্কুল-কলেজে গেছেন। স্বাভাবিক পড়াশোনা করেছেন। প্রথম বিভাগ পেয়েই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যেতো। টিউটরিয়াল নয়, তারা পরস্পরের সঙ্গে নোট বিনিময় করে পড়াশোনা করতো। ছেলেরা অচেনা ছিল না। বয়সের তফাৎ, সামাজিক ব্যবস্থাপনা মেনে চলতো। পরস্পর ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং পরস্পরের চাহিদাকে পরস্পরের কাছে জানা থাকতো। প্রেমও হতো, বিয়েও হতো, ভেঙেও যেতো প্রাথমিক প্রেম। যা নিয়ে গোপন দীর্ঘশ্বাস ছিল, বড় বড় চিঠি ছিল। কিন্তু সামাজিক সংঘাত ছিলো না। বন্ধুত্বও বজায় থাকতো। সবচে' বড় কথা স্বপ্ন ছিল, ছিল স্বপ্নের সীমানা। স্বপ্ন ভিত ছিল বাস্তবতা, সামাজিক বাস্তবতা।

আমার এক চাচা ষাট দশকে ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। এখন মধ্য পঞ্চাশে। মহাসুখী, সংসারী। ছেলেমেয়েরা বড়। তার দেখি দু'একজন ছাত্র জীবনের বান্ধবী এখনো আসে। তারা জমিয়ে আড্ডা দেয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, চাচা শুধু বন্ধুত্ব করতে, প্রেম হয়নি কারো সঙ্গে?

'প্রেম আর বন্ধুত্ব দুটো ভিন্ন জিনিস, আবার একটা ছাড়া অন্যটা হয় না। সবচে' সুন্দর এই মাঝখানের সীমারেখাটা। চাচার সীমারেখারও জোর দিলেন। এটাই আমাকে অনেক চিন্তা করিয়েছে। সম্পর্ক মানেই কিন্তু সীমারেখা, চিহ্নিত দায়বদ্ধতা এক একটি সম্পর্কের মানে এক এক রকম। কেউ ভাবী, কেউ চাচা, কেউ বন্ধু।' চাচাই বলেছিলেন।

'যেমন বছরখানেক যায় আমরা বন্ধু না প্রেমিক এটা দ্বিধার মধ্যে। এই ফাঁকে হয়তো আর একজন এসে যায় অথবা একটা ঘটনায় দু'জন একটু ছিটকে যায়, আবার দ্বিধা নিয়েই কাছাকাছি আসা।...'

অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন চাচা। জানালায় তাকিয়ে মৃদু হাসছেন।

এর পরের আলোচনায় দু'জন একটি সমাজ ব্যাখ্যায় চলে গেলাম যা এই লেখার বিষয় নয়। তবে ব্যাখ্যায় দেখা গেলো তাদের বন্ধুদের মধ্যে গ্রামের ছাত্রী ছিল, ছিল গরিব ঘর থেকে আসা ছাত্র। বন্ধুত্ব নির্ধারিত হতো মেধার ভিত্তিতে, মননের ভিত্তিতে। প্রেমের ভিত্তিও ছিল তাই।

এখন যেহেতু আমরাই রুলিং ক্লাস, আমাদের মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা পতিত মধ্যবিত্ত। এদের মধ্যে অনাহুত প্রবেশ করেছে টাকা নিয়ে নবাগত উচ্চ মধ্যবিত্ত। আচার-আচরণে তারা সামন্ত গ্রামীণ। তারা গ্রামের সম্পদ নগরে শিফট করেছে। এখানে শ্রেণীবিন্যাস ঘটছে সেভাবে। ঢাকা শহর নির্মাণ হচ্ছে সেভাবেই। স্কয়ার ফুট হিসেবে ক্লাস নির্ধারণ করা যায়।

সমস্যা এখানেই। চিঠি লেখার সময় আগে যেমন শ্রেণী সচেতনতা ছিল অথচ শ্রেণী বিভাজন এতো তীব্র ছিল না। এখন শ্রেণী

বিন্যাস ঘটছে, আকাঙ্ক্ষার বিন্যাস বা সীমা নির্ধারণ হচ্ছে না। ১৮ বছরের ছেলেটি নিজের সীমা, তার স্বপ্নের সীমা সে দিতে এখনো রাজি হচ্ছে না বলে লিখছে, 'আমি' ওকে ভালোবাসি ও বাসবে না কেন?

আমি দেখছি স্বপ্নের বা আকাঙ্ক্ষার বা চাহিদার একটি সামাজিক সীমারেখা থাকে যা অনেকদিন থেকে দিগন্তহীন হয়ে গেছে। কেউ নিজের অবস্থানটা বুঝে নিতে পারছে না অন্তত একটি বয়স পর্যন্ত। ২০ বছর পার হলেই বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেই বুঝতে পারছে, গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। অসুবিধা হচ্ছে নব্যধনীদের নিয়ে। তারা নাগরিক হবার জন্য উগ্র হয়ে ওঠে।

এটা সমাজের উপরি কাঠামোর ঘটনা। নগর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। এখানেই অনেক বিভাজন এখন। যেহেতু এখন আমরাই রুলিং ক্লাস। এখান থেকেই সমাজপতি তৈরি হয়, আমলা তৈরি হয়।

এখানেই গোপনে সমাজে দু'তিনটি সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি হয়ে গেছে। এক বলয় অন্য বলয়ের খবর জানে না। বলয়ের মধ্যে অন্য আবার উপবলয় আছে, পকেট বলয় তৈরি হচ্ছে। সবাই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।

এখন একটি মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছে। যারা এই চিঠি থেকে কবিতা পড়ে দুপুরে, ভিন্ন ধারার ছবি দেখে বা বইমেলায় আড্ডায় সমাজকে সচল রেখেছে। আমাদের আলোচনায় এরাই সচল সমাজের মৌলিক ধারা। এই ধারা থেকে উত্থান হয়, এই ধারা পতিত হয়। এই ধারায় আসে নতুন যাত্রী। ধারা কখনো ব্যাহত হয় না।

তবে সমস্যা আছে মৌলিক ধারায়। আন্দোলন নেই, রাজপথের আন্দোলন। রাজনীতি ক্যাডারদের দখলে অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ কাঠামো থেকে সাধারণ ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে কেবল পরিচয় ঘটছে, দেখা সাক্ষাতের জায়গা নেই। এর পরিধি নাগরিকতায় বাড়ছে না, ক্রমে কমছে। চলাফেরা ক্রমে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যানজট, অনিয়ন্ত্রিত বাস (এখানেও মাস্তান) এবং বাস রুট চলাফেরার জন্য অনেক পয়সা লাগে। আসলে আমাদের জীবনধারা এখন স্বাভাবিক ধারায় এগুতে পারে না। গণতন্ত্রের পাহারাদাররা মাস্তান পালন করে ক্ষমতায় থাকার জন্য, মাস্তানরা দোকানপাট থেকে পাড়ায় পাড়ায় মানুষের পথঘাট ফুটপাতে চলাফেরা সব নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ বন্দি হয়ে যাচ্ছে চার দেয়ালে। গ্রামে-গঞ্জে মাস্তান ছাড়া আছে ধর্মের পাহারাদার, রাজনীতিবিদের চেলারা এখানে ঘুরছে, ধর্মের নামে সব কিছুতে ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। বন্দি জীবনে বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে দিয়ে তরুণ সম্প্রদায় বা কি ভয়াবহ পর্যায়ে যাবে তা রাষ্ট্র পরিচালকরা এখনো ভাবছেন না। তারা শুধু চান ক্ষমতায় টিকে থাকতে। প্রজন্মের ভাবনা তাদের নেই।

পুনশ্চ : বাসাবাড়ির কনসেপ্ট পাল্টে গেছে এই নগরে। এখন নাগরিকদের বাস এপার্টমেন্টে, খুপরি ঘরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় পাশাপাশি, হেঁটে যেতে হয় একই পথ ধরে। এত কাছাকাছি থাকলেও পরস্পরকে চেনে না। ঘরের নম্বর নিয়ে পরিচয়। কয়েক গজের মধ্যে বড় হচ্ছে ছেলেটি, মেয়েটি। কিন্তু অচেনা। হঠাৎ একদিন মেয়েটির ঘরের সামনে আলপনা আঁকা হলো। মেয়েটি চলে গেল বিয়ে হয়ে। ছেলেটিও দেখা গেলো একদিন গোপনে কোথায় পাড়ি দিয়েছে। একইভাবে জয়াদের পাশের বাড়ির ছেলেটা চলে গেল। অনেকদিন পর হঠাৎ ২০০০-এ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন ছাপা হলো জাপান থেকে : জয়া, তোমরা কলোনির আমাদের ফ্লোরেই পাশের এপার্টমেন্টে থাকতে, আমি সেই ছেলেটি, সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, গাইছিলাম 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না...'। তুমি অস্ফুট গাল দিয়েছিলে, 'অসভ্য'। আমি তো গানটি আগে থেকে গাইছিলাম। তোমাকে তো আমার দেখার কথা না! গালটা কি দিয়েছিলে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে? গালের মানেটা জানতে ইচ্ছে করে আজো। তোমরা ওখান থেকে চলে গেছো মা লিখেছেন। এখন যেখানে থাকো নিচের ঠিকানায় উত্তর দেবে। কিছু না হোক, লিখেই বল, 'অসভ্য'! ইত্যাদি...।

এই পরস্পর না জানা অথচ জানার ইচ্ছে এটাই আমি বলতে চেয়েছি। ওপর কাঠামোয় গিয়ে সহজ হয় চারদিক দেখে, কিন্তু উদ্ভিন্ন যৌবনে এরা পরস্পরের অচেনা থাকে। পরিচয় হলে বিরোধ বাধে বা অঘটন ঘটায়। সামাজিকতা নেই। পারিবারিক বিধি নিষেধ আরোপ করা সোজা। মেলামেশার সামাজিক পরিধি নির্ধারণ করা কঠিন বলে ওটা আর হয়ে ওঠে না। অথচ সেটাই হওয়া প্রয়োজন। তার জন্য সামাজিকতা প্রয়োজন, নাগরিক চর্চা প্রয়োজন। তা হয় না। গোপনে দু'জন পরিচিত হতে চায়। তা হয়ে ওঠে না। তারপর দেখা যায় চিঠিতে হা হুতাশ এবং বারবার পেছন ফিরে খোঁজা। ছেলে বিদেশ গিয়ে চারদিক দেখে চোখকান খুলে গেলে ভাবে এত সহজ বিষয়টা কেন সহজ ছিল না!

আসলেই বিধি নিষেধ, সন্ত্রাস বর্তমান প্রজন্মকে গৃহবন্দি করেছে। পত্র হয়ে উঠছে তাদের অবলম্বন। পাশের পরিচিতজন হারিয়ে যাচ্ছে, যে জন্যে পত্রে পত্রে পরিচয় হচ্ছে, অচেনা অন্যজনকে চিনতে চাচ্ছে। ছেলেটি চাচ্ছে মেয়েটিকে জানতে, মেয়েটি একটি ছেলেকে জানতে। সমাজ পাশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রেখেছে কিন্তু পত্রলেখায় বন্ধুত্বে যেন বাধা নেই। অচেনা, না দেখা কাউকে মনের কথা উজাড় করে দিচ্ছে এই পত্রলেখায়।

সমাজ ম্যাচ্যুরিটি ফিরিয়ে আনা হলে, সময় হয়তো লাগবে, কিন্তু নতুন প্রজন্মকে পরস্পরকে জানতে হবে। ফতোয়া, সন্ত্রাসের বাইরে আনতে হবে গণতন্ত্রকে। গণতন্ত্রই দিতে পারে মানুষের সব সামাজিক অধিকার। বাঁচাতে পারে প্রজন্মকে।